সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন

অতীন্দ্রমোহন গুণ

মানস দাশগুপ্ত, সমাজতন্ত্রবাদের নায়ক এবং প্রতিনায়ক ; সমতট প্রকাশন ; কলকাতা, ২০০৪

সমাজতন্ত্রবাদ (বা সমাজবাদ) যেসব মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেয় সেগুলি হল স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র। এসব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মালিকানা এবং উৎপাদন ও আয়বন্টনের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুত্ব আরোপের কারণেই এমন জীবনদর্শনকে সমাজবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমাজবাদী চিন্তকরা এমন এক ভবিষ্যতের কথা ভেবেছেন যেখানে জনগণ পুঁজিবাদীদের হাত থেকে উৎপাদনের উপকরণগুলি এবং শাসনযন্ত্র নিজেদের হ াতে তুলে নেবে। ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটা কীভাবে ঘটবে, অহিংস পন্থায় না হিংসা বর্জন করে, উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থ ার উপর কতখানি নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে--- এসব বিষয়ে অবশ্য সমাজবাদী চিন্তকদের মধ্যে কমবেশি মতভেদ রয়েছে।

সমাজবাদী চিন্তকদের মধ্যে কার্ল মার্ক্স অবশ্যই সর্বাগ্রগণ্য। ১৮৪৮ সালে মার্ক্স ও তাঁর সহযোগী ফেডরিক এঙ্গেলস Communist Manifesto বইটি প্রকাশ করলেন। তাঁর অন্য বিখ্যাত বই Das Kapital ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মার্ক্স সম াজবাদের এক সুসংবদ্ধী তত্ত্ব খাড়া করলেন যার কেন্দ্রে রয়েছে কয়েকটি মৌল ধারণা ঃ উদ্ধৃত্ত মূল্য, শ্রেণী সংগ্রাম এবং সর্বহারার একনায়কত্ব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দোষত্রুটি চিহিত করে এ ব্যবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়েশ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক উদ্যোগে সশস্ত্র বিপ্লবের পথই মার্ক্স-এঙ্গেলস বেছে নিয়েছিলেন।

১৯১৭ সালে শ দেশে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করল। মার্ক্সীয় সমাজবাদের সেটা ছিল মহা গৌরবের কাল। কারণ, বলশেভিক দল মার্ক্স নির্দেশিত কর্মসূচি গ্রহণ করেই বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে শাসনকার্য চালিয়েছে। ত্রমে শদেশ ও তার পূর্বতন উপনিবেশগুলিতে সমাজবাদী শাসন প্রসারিত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থাপনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অ াত্রমণ প্রতিরোধ এবং সে বাহিনীকে পযুদস্ত করার পর মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। জার্মান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবণ করে সোভিয়েত লালফৌজ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রবেশ করার পর সেসব দেশেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হল। কিছু দিনের মধ্যে এশিয়ার চীন, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া এবং আমেরিকার কিউবাতেও সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা দখল করলেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় বিশ শতকের মধ্যভাগের তিন দশক সময় ছিল সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার কাল। সমাজতন্ত্র দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি, কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সেসব দেশের লক্ষণীয় অগ্রগতি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থের মতো মৌল প্রয়োজনের প্রতি রাষ্ট্রের সযত্ন দৃষ্টিপাত বিশ্বের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের কাছে মুক্তির, উন্নততর জীবনের বার্তা বহন করে এনেছিল।

কিন্তু বিগত শতকের অষ্টম দশক থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছিল। ১৯৯১ সালে গরবাচেভের শাসনকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ কোনো ষড়যন্ত্রের ফলে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন আপন ভারেই ভেঙে পড়ল। একে একে পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিতে এবং এশিয়ার কাম্বোডিয়ায় সমাজতন্ত্রীরা শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত হলেন। বর্তমান সময়ে শুধু চীন দেশে একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি এবং পুঁজিবীদী অর্থনীতি চালু রয়েছে ; উত্তর কোরিয়ার মানুষ নিজেদের তুলনায় তাদের দক্ষিণী প্রতিবেশীদের সমৃদ্ধি লক্ষ করে হতাশায় ভোগে ; "... কিউবার কম্যুনিজমের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভরতুকি কম্যুনিজম' ; আর ভিয়েতনাম এক দেশ, তবে 'দুই পথ।'"। তাই বর্তমান সময়ে মার্ক্সীয় সমাজবাদের চিত্রটিকে কোনোমতেই উজ্জ্বল বলা চলে না।

সমাজতন্ত্রের মৌল মূল্যবোধগুলির প্রতি আমাদের আনুগত্য কিন্তু এখনও অটুট। ফলে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রে বর্তমান দুরবস্থার পেছনে কী কী কারণ কাজ করেছে তা নিয়ে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অর্থনীতি অধ্যাপক ডঃ মানস দাশগুপ্ত তাঁর নাতিদীর্ঘ বইটিতে পরোক্ষে কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে যে ব্যক্তিরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের ভাবধারা, ব্যক্তিত্ব ও সুকৃতি-দুষ্কৃতিই তাঁর আলোচনার প্রধান উপজীব্য।

আলোচনা আরম্ভ হয়েছে ফরাসি চিন্তক পিয়ের-যোশেফ প্রুধোঁকে নিয়ে। মানবদরদী প্রুধোঁ মার্ক্সের মতোই মনে করতেন যে শ্রমিককে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে উৎপাদনের লাভ যখন তুলে দেওয়া হল তখনই শোষণের আরম্ভ হয়েছে। "অর্থের অধিকার যদি শ্রমিকের হাতে এসে পড়ে তা হলে শুধু যে ধনবৈষম্য দূর হবে তাই নয়, শ্রেণীবিভেদও দূর হতে বাধ্য হবে, আর তাই রাষ্ট্রের দরকার ফুরিয়ে যাবে....।" রাষ্ট্রকে শোষণের অন্যতম স্তম্ভ বলে তিনি মনে করতেন। তাই এমন পরিবর্তন তাঁর কাছে অভীপ্সিত মনে হয়েছে। প্রুধোঁকে নৈরাজ্যবাদী (anarchisto) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসলে মার্ক্স চেয়েছেন আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের বিলোপসাধন, অন্যদিকে প্রুধোঁ চেয়েছেন যততাড়াতাড়ি সম্ভব বিলোপ সাধন--নিঃশেষে অবলুপ্তি। প্রুধোঁ বিপ্লববাদী ছিলেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে গেলে রাষ্ট্রকে বলশালী হতে হবে। মানসবাবুর বক্তব্য,"ইতিহাসের খামখেয়ালিপনায় মার্ক্সকে আমরা...অমর করে রেখেছি...অথচ প্রুধোঁকে কোনো এক অজানা নির্দেশে সরিয়ে রেখেছি ফুটনোটের তলায়।"

লেনিনের প্রায় সমবয়সী রোজ লুক্সেমবুর্গ জন্মসূত্রে পোলিশ, কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কারণে জার্মেনিতে চলে এসেছিলেন. মার্ক্সবাদী হওয়া সত্ত্বেও সমাজবাদ আর স্বাধীনতা যে পরস্পর - বিরোধী নয় তিনি ছিলেন এ-তত্ত্বের প্রবক্তা। কেন্দ্রীভূত পার্টিই বিপ্লবের একমাত্র বাহন এটা তিনি মনে করতেন না, কারণ পার্টিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে শুধু উপরতলার নেতাদের। কম্যুনিজমের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। হয়তো এমন বিশ্বাসের জন্যই ১৯১৯ সালে গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হল।

নিকোলাই বুখারিন ছিলেন লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। লেনিন যখন মৃত্যুশয্যায় সে-সময়ে বুখারিন ছিলেন তাঁর সবচেয়ে কাছের লোক। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম ভাবনা চিন্তা বর্ণনা করে বুখারিন যে সব বই লিখেছেন তার মধ্যে বুখারিনের নিজস্ব ভাবনাও প্রকাশ পেয়েছে। কেন কৃষিপ্রধান দেশেও বিপ্লব হতে পারে, আর বিপ্লবে কৃষকদের অবদান যে কোনো অংশে শ্রমিকদের তুলনায় কম হবে না, এটা তিনি বলেছেন। শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে তিনি মৈত্রী চেয়েছিলেন যেন কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষিত না হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ধীরে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। সমস্ত শিল্প - বাণিজ্য জাতীয়করণেরও তিনি সমর্থক ছিলেন না ; এবং তিনি মনে করতেন যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে ভোগ্যপণ্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে, তার উৎকর্ষও বাড়বে। স্তালিন আমলে ত্রৎস্কির সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ে স্তা

লিন বুখারিনের সমর্থন কাজে লাগিয়েছেন। (তার আগে জিনোভিয়েভ ও মামেনেভকে কোণঠাসা করার কাজেও বুখারিনের মদত নিয়েছেন।) তাই প্রথম দিকে স্তালিন রাষ্ট্র-পরিচালনায় বুখারিনের পরামর্শ মতো চলেছেন। কিন্তু পর্যুদস্ত হয়ে ত্রৎস্কি রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর বুখারিণের প্রয়োজনওফুরিয়ে গেল। ১৯৩৬ সালে তাঁকে গেপ্তার করা হল। ঝিাসঘাতকতা, দেশদ্রোহ, লেনিনকে হত্যার ষড়্যন্ত্র ইত্যাদি নানা অভিযোগে তাঁর বিচার হল এবং তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

লেনিনের সহয়োগীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী ছিলেন লিও এৎস্কি। বিশ শতকের শুতে লেনিন জারের গুপ্তচরদের তাড়া খেয়ে দেশ থেকে পালিয়ে বেড়াচেছন। ঐ সময়ই (১৯০২ সালে) ত্রৎস্কিও দক্ষিণ রাশিয়ার এক বিদ্রোহের পর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন ; কিন্তু ওখান থেকে পালিয়ে তিনি লন্ডনে লেনিনের বাসস্থানে হাজির হলেন। ত্রৎস্কির বয়স তখন কুড়ি, লেনিনের বয়স বত্রিশের মতো ! গণিতের মেধাবী ছাত্র, মননশীল প্রবন্ধের লেখক, আর ফরাসি ও জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত এই তণটিকে লেনিন একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত Iskra ('স্ফুলিঙ্গ') পত্রিকার অনেকটা দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হল। কিন্তু এর পরিচালনার প্রন্নই লেনিনের সহয়োগীরা 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক'এই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেলেন। দেশে ফিরে ১৯০৫ সালের বিপ্লবে দুটি গোষ্ঠীই অবশ্য একযোগে কাজ করেছে। কিন্তু ত্রৎস্কি ও অন্য মেনশেভিকরা যতটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন, লেনিন ও তাঁর বলশেভিক গোষ্ঠী ততটা দিতে পারে নি। জার কঠোর হাতে সে বিপ্লব দমন করেছিলেন। ত্রৎস্কিকে আবার সাইবেরিয়ায় পাঠানো হল, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে তিনি ফিনল্যান্ডে হাজির হলেন ; সেখানে আগেই লেনিন পৌঁছে গেছেন। ১৯১৪ সালে ঝিযুদ্ধ শু হলে, ত্রৎস্কি লেনিনের মতোই সিদ্ধান্ত নিলেন এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর অংশগ্রহন অর্থহীণ হবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রন্ন ত্রৎস্কি মেনশেভিক গোষ্ঠী ত্যাগ করে বলশেভিক গোষ্ঠিতে যোগ দিলেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আরম্ভে তিনি পেত্রোগাদ শহরে ফিরে এসে বিপ্লবে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শ সেনাদলের যত পরাজয়ের খবর আসছে দেশের মধ্যে ততই অসন্তোষ বাড়ছে। চারদিকে কলকারখানায় ধর্মঘট, সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধে অনীহা, কৃষকদের মধ্যেও ধূমায়িত হচেছ বিদ্রোহ। ১৯১৭-র মার্চ মাসে কেরেনস্কি সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে জার নিকোলাস রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন। মেনশেভিকরা কোরেনস্কির সঙ্গে সহযোগিতা করলেও বলশেভিকরা চাইলেন শ্রমিকদের গঠিত সোভিয়েতগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। কেরেনস্কি সরকারকে হাটিয়ে ক্ষমতা দখলের কাজে ত্রৎস্কিই তাঁর গড়া 'লাল ফৌজ' নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশে বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরও অনেকদিন বিদেশি সাহায্য পুষ্ট কেরেনস্কির 'সাদা ফৌজ' লড়াই চালিয়ে গেছে। শেষে ত্রৎস্কির লালফৌজ শত্রুদলকে পযুদস্ত শান্তি স্থাপনে সমর্থ হয়। তিন্তু ত্রৎস্কি তাঁর পাণ্ডিত্য,বাগ্মিতা, রণনৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতার দৌলতে একদিকে লেনিনের যত সান্নিধ্য গেছেন, ততই তিনি পার্টির মধ্যে শত্রু তৈরি করেছেন। স্তালিন ও ত্রৎস্কির দ্বন্দ্ব লেনিনের জীবদ্দশায়ই সু হয়েছিল। এৎস্কি লালফৌজের সংস্কারে হাতদেওয়ায় অনেক সেনাধ্যক্ষও তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে ত্রৎস্কি যে খুব একটাপ্রত্যাঘাত করেছেন এমনও নয়। লেনিনের মৃত্যুর পর "এই ক্লান্ত - শ্রান্ত- বিষণ্ণ সৈনিক কোনো এক ভাগ্যের হাতে যেন নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন"। তারপর একদিন তিনি গুপ্ত পুলিশের হাতে গেপ্তার হলেন। তাঁকে সাইবেরিয়ায়পাঠানো হলে তিনি সেখান থেকে আশ্রয় নিলেন মেক্সিকোতে। সেখানেই একদিন আততায়ীর হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হল।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মধ্যমণি ছিলেন অবশ্যই যোশেফ স্তালিন। রাশিয়াকে তিনি বিন্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করেছেন। হিটলারের সেনাবাহিনীকে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু এজন্য তাঁর দেশবাসীকে বিরাট মূল্যদিতে হয়েছে। লেনিনের মৃত্যুর পর প্রথম দিকে স্তালিন পার্টিকে পরিচালনা করেছেন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভেরসাহায্যে। ত্রৎস্কিই ছিলেন স্তালিনের প্রধান সমালোচক। স্তালিন যখন এক দেশে (অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে) সামতন্ত্রের প্রবক্তা, তখন ত্রৎস্কি বলেছেন ঝিবিপ্লবের কথা। যদিও অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রন্ন ত্রৎস্কিরঘোষিত নীতি স্তালিন প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, কিন্তু রাজনীতির বেলায় উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। ত্রমে জিনোভিয়েভ-কামেনেভের মদত নিয়ে স্তালিন ত্রৎস্কিকে কোণঠাসা করেছেন। ত্রৎস্কির অপসারণের পর এঁরা দু'জন নিজেরাই লাঞ্ছিত হয়েছেন।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সময়ে 'পার্জ'-এ সাজানোবিচারে বহু লোককে সাজা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিপুজা এমন চরম রূপ পেয়েছিল যে স্তালিন প্রায় দেবতা বলে গণ্যহতে লাগলেন। বলা হতে লাগল যে স্তালিনের নেতৃত্বেই রাশিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে কৃষিতে, শিল্পে,বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে, সাহিত্যে, চাকলার চর্চায়। তাঁর মৃত্যুর পরই ক্রমশ পরিষ্কার হল যে স্তালিন কতটা নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ১০ই মার্চ খ্রুশ্চেভের বক্তৃতায় অনেক তথ্য বেরিয়ে এল। হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত সময়ে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ লোককে 'জিজ্ঞাসাবাদ' -এর জন্য গুপ্ত পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আর এর মধ্যে ৭০ লক্ষ লোক বন্দী অবস্থায় মারা যায়।

চীন দেশীয় সমাজতন্ত্রের দুই রূপকার মাও জে-দং দেং শিয়াও - পিং-কে নিয়ে মানস দাশগুপ্ত আলোচনা করেছেন। কৃষকদের দিয়ে বিপ্লব পরিকল্পনাই মাওবাদের প্রধান কথা। সমাজতন্ত্রকে মাও অনুন্নত, কৃষিপ্রধান দেশের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। শতধা বিভক্ত চীনদেশে তিনি শৃঙ্খলা এনেছেন জাতীয়তাবাদী চেতনার তিনি উন্মেষ ঘটিয়েছেন। শতধা-বিভক্ত চীনদেশে তিনি শৃঙ্খলা এনেছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনার তিনি উন্মেষ ঘটিয়েছেন। শতধা বিভক্ত চীনদেশে তিনি শৃঙ্খলা এনেছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনার তিনি উন্মেষ ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আমলে তিনি ছিলেন সব আইনের ঊর্ধ্বে। কোনো সদর্থক সম্ভাবনা না থাকলেও মাও Great leap Forward করতে গিয়ে শেষে পিছু হটেছেন। তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লব এনেছিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। অনেকটা এর ফল হিসেবেই দক্ষিণপন্থী দেং-এর উত্থান। ১৯৭৬ সালে মাওয়ের মৃত্যুর পর কিছুকাল মাওপন্থীরা দেং-এর বিরোধিতা করে গেছেন। কিন্তু ১৯৮০ সালে নাগাদ দেং সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা হাতে নিলেন। চৌ-এন-লাইয়ের মতো দক্ষ প্রশাসক এবং অনেক বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে লাঞ্ছনা -অবমাননার শিকার হয়েছিলেন। দেং এঁদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি সংস্কারের কর্মসূচি শু করলেন। তবে সে-সংস্কার রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক। বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগে চীন সব দেশের পুরোভাবে, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিহারও অত্যন্ত চমকপ্রদ। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলছে একদলীয় শাসন এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র। দেং-এর মৃত্যুর পরও এ দ্বৈত ব্যবস্থাই চলছে।

পুস্তকের শেষ অধ্যায়টি ('সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাও সাহিত্য') মূল্য আলোচনার প্রেক্ষিতে খানিকটা খাপছাড়া বলে মনে হবে। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত দেশের প্রথম রাইটার্স ইউনিয়নে ঝ্দানভ বলেছিলেন, "সমাজতন্ত্রের সাফল্যেরজয়গান গাওয়াই লেখক ও শিল্পীর একমাত্র উদ্দেশ্য। ... সমাজগঠনে সমাজতন্ত্র ও পার্টিকে তুলে ধরাই হবে লেখকও শিল্পীর আদর্শ।"এ ধারাটিরই নাম দেওয়া হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। তবে স্তালিন আমলেই অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রশ্ন ছিলঃ মহৎ সাহিত্য, মহৎ শিল্প কি হুকুমমাফিক তৈরি করা যায়? বস্তুত মানসবাবু জোর দিয়েছেনএ কথাটার উপর যে সোভিয়েত শাসনে মহৎ শিল্প, মহৎ সাহিত্য রচনা বন্ধহয়ে গিয়েছিল। তবে সেখানে স্বাধীনতার বাতাবরণ তৈরি করার শিল্পী সাহিত্যিকরা যে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন সে কথাটাও মানস দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন।
সমাজতন্ত্রের নায়ক - প্রতিনায়কদের নিয়েই মানসবাবুর আলোচনা। ('প্রতিনায়ক' বলতে মনে হয় তিনি রোজ লুক্সেমবুর্গ, বুখারিন ও ত্রৎস্কির মতো ব্যর্থ বা উপেক্ষিত / লাঞ্ছিত নায়কদের বুঝিয়েছেন।) তবে বইটি পড়ে এটাই মনে হবে যে দলনেতাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বই মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছে। বস্তুত সমাজতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠী অত্যাচারী ও নিপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করায় পৃথিবী জুড়ে সাধারণ মানুষ যে সমাজতন্ত্রের কল্যাণকর, মানবতাবাদী দর্শন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে উঠছে এটাই বরং পরিতাপের বিষয়।

মানস দাশগুপ্ত সাবলীলভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনাশৈলী প্রশংসনীয়। কয়েক স্থানে সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রচলিত কিছু হাস্যরসের নমুনা এবং ভগবান্ বুদ্ধের বাণী থেকে উদ্ধৃতি বইটিকে সুপাঠ্য করে তুলেছে।
বইটির মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ যথাযথ। তবে প্রুফ দেখার কাজটি আরও সষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা উচিত ছিল। কয়েক স্থানে বিদেশি নাম বাংলা বানানে লিখতে গিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, জার্মান Brest-Litovsk হয়েছে 'ব্রেস্টলিভস্টক', শ পত্রিকা Novy Mir ('নতুন -জগৎ') হয়েছে 'নভি নীর'। আশা করছি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে বইটিকে এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা যাবে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com